জামায়াতে ইসলামীর

বৈশিষ্ট্য

জামায়াতে ইসলামীর বৈশিষ্ট্য

অধ্যাপক গোলাম আযম

প্রকাশনা বিভাগ
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
৫০৪/১ এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।
ফোন ঃ ৮৩৫৮৯৮৭, ৯৩৩১৫৮১, ৯৩৩১২৩৯

জামায়াতে ইসলামীর বৈশিষ্ট্য

অধ্যাপক গোলাম আযম

প্রকাশক ঃ আবুতাহের মুহাম্মদ মা'ছুম
চেয়ারম্যান, প্রকাশনা বিভাগ
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
৫০৪/১ এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।
ফোন ঃ ৮৩৫৮৯৮৭, ৯৩৩১৫৮১, ৯৩৩১২৩৯

প্রথম প্রকাশ ঃ ফেব্রুয়ারী- ১৯৮২

৮ম মুদ্রণ ঃ অগাষ্ট - ২০১২
শ্রাবণ - ১৪১৯
রমজান - ১৪৩৩

নির্ধারিত মূল্য ঃ ১২.০০ (বার) টাকা মাত্র।

মুদ্রণে ঃ আল-ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩ এলিফ্যান্ট রোড
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৯৩৪৫৭৪১, ৯৩৫৮৪৩২

Jamaate Islamir Boisista, by Prof. Ghulam Azam, Published by: AbuTaher Mohammad Ma'sum, Chairman, Publication Department, Bangladesh Jamaate Islami, 504/1 Elephant Road, Baro Moghbazar, Dhaka-1217.

Fixed Price : 12.00 (Twelve) taka only.

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

জামায়াতে ইসলামীর বৈশিষ্ট্য*

জামায়াতে ইসলামীর কর্মী ও সদস্যদের (রুকন) নিকট নতুন করে তাদেরই প্রাণপ্রিয় জামায়াতের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা আপাতদৃষ্টিতে অপ্রয়োজনীয় মনে হতে পারে। কিন্তু এ আলোচনা অত্যাবশ্যক। কারণ জামায়াতে ইসলামী গতানুগতিক কোন ইসলামী দল নয়। বাংলাদেশে বহু দল ও প্রতিষ্ঠান ইসলামের বিভিন্ন ধরনের খেদমত করে যাচ্ছে। মাদরাসা, খানকাহ, তাবলীগ, ওয়ায, দরসে কুরআন, ইসলামী সাহিত্য ইত্যাদির মারফতে ইসলামের ব্যাপক খেদমত হওয়া সত্ত্বেও যে কারণে অবিভক্ত ভারতে ১৯৪১ সালে জামায়াতে ইসলামী কায়েম হয়েছিল, সে কারণেই এখনও এ জামায়াত আপন বৈশিষ্ট্যের দরুনই এদেশেও অপরিহার্য।

পাক-ভারত-বাংলা উপমহাদেশে "জামায়াতে ইসলামী" এমন একটা নাম, যা ইসলামী আন্দোলনের প্রতিশব্দে পরিণত হয়েছে। ইসলামী আন্দোলন কুরআন পাকে বর্ণিত "জিহাদুন ফী সাবীলিল্লাহ" কথাটিরই সার্থক অনুবাদ। আর নবী করীম (সা.) ইকামাতে দ্বীনের যে সফল সংগ্রাম করে গেলেন, সে মহান প্রচেষ্টাকেই "জিহাদুন ফী সাবীলিল্লাহ" বলা হয়েছে। আল্লাহর শেষ নবী আল্লাহর দ্বীনকে দুনিয়ায় বিজয়ী করার যে মহান আন্দোলন করে বাস্তবে তা কায়েম করে গেলেন ঠিক সে উদ্দেশ্যে, কর্মনীতি ও কর্মসূচী নিয়ে জামায়াতে ইসলামী ছাড়া এ উপমহাদেশে আর কোন নামে কোন সংগঠন আছে বলে আমাদের জানা নেই। ইসলামের বিভিন্ন ধরনের বড় বড় খেদমতে নিযুক্ত অগণিত দল, সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান অবশ্যই আছে এবং এ সব খেদমত নিশ্চয়ই ইকামাতে দ্বীন ও ইসলামী আন্দোলনের সহায়ক। কিন্তু সরাসরি ইকামাতে দ্বীনের প্রোগ্রাম ও প্রস্তুতি আর কারো মধ্যে দেখা যায় না।

জামায়াতে ইসলামীর বাইরে এত উলামা, মাদরাসা, খানকাহ ও সংগঠন থাকার ফলে সাধারণ মুসলমান তো বটেই, এ জামায়াতের সাথে সম্পর্কিত সব লোকের পক্ষেও তুলনামূলকভাবে বিচার করে জামায়াতে ইসলামীর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ

---

* ১৯৮১ সালের ২৩শে অক্টোবর থেকে ২৬শে অক্টোবর পর্যন্ত ঢাকার হোটেল ইডেনে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর এক সাংগঠনিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে ২৫শে অক্টোবরের সান্ধ্য অধিবেশনে থানা নাযেম ও সদস্যদের (রুকন) উদ্দেশ্যে অধ্যাপক গোলাম আযম ভাষনটি পেশ করেন।

জামায়াতে ইসলামীর বৈশিষ্ট্য আলোচনার সাথে সাথে জামায়াতের কর্মীদের বৈশিষ্ট্যও একই প্রসংগ হিসাবে পাঠক-পাঠিকাদের কাছে তুলে ধরা প্রয়োজন। এ বিষয়ে জামায়াতের বুলেটিনে প্রকাশিত অধ্যাপক সাহেবের লেখা একটি প্রবন্ধ এ পুস্তিকার শেষাংশে যোগ করা হয়েছে।

গুণাবলীকে ভালভাবে বুঝতে পারা সহজ নয়। জামায়াতে ইসলামীর রুকন ও কর্মীদের মারফতেই অন্যদের পক্ষে এসব বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করা সম্ভব। তাই এ সম্মেলনে এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি আলোচনা করা অত্যাবশ্যক বিবেচনা করা হয়েছে।

মূল বক্তব্য শুরু করার আগে একটা কথা জামায়াতের রুকন ও কর্মীদের ভালভাবে খেয়াল রাখার জন্য অনুরোধ করছি। একথা সত্য যে, জামায়াতে ইসলামী ছাড়া ইকামাতে দ্বীনের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার জন্য এদেশে আর কোন সংগঠন নেই। কিন্তু এ অবস্থাটা জামায়াতের জন্য কোন সুখবর নয়। যদি এ জামায়াত ছাড়াও ইসলামী আন্দোলনের আরও কতক সংগঠন থাকতো, তাহলে প্রতিযোগিতার সুযোগ হতো এবং গুণগত দিক দিয়ে হয়তো দ্রুত অগ্রগতি লাভ করা সম্ভব হতো। ইকামাতে দ্বীনের আর কোন বলিষ্ঠ আন্দোলন এদেশে নেই বলে জামায়াতের সাথে সম্পর্কিত লোকদের গর্ববোধ করারও অবকাশ নেই। এ জামায়াত যদি কোন কারণে সফল হতে না পারে, তাহলে অন্য কোন জামায়াত থাকলে তাদের দ্বারা আল্লাহর দ্বীন বিজয়ী হওয়ার আশা করা যেতো। বর্তমান অবস্থায় দ্বীনের বিজয় একটি মাত্র সংগঠনের কর্মশক্তির উপর নির্ভরশীল মনে হচ্ছে। এটা আমাদের জন্য সংগঠনের আত্মগৌরবের বিষয় নয়, বরং এ অবস্থায় আমাদের মধ্যে দায়িত্ববোধ ও কর্তব্যের অনুভূতি গভীরভাবে হওয়াই উচিত। আল্লাহ পাকের কাছে আমাদের সর্বদা কাতরভাবে দোয়া করতে থাকতে হবে, যাতে আমাদের অবহেলা ও আযোগ্যতার দরুন ইকামাতে দ্বীনের এ আন্দোলন বিফল না হয়।

জামায়াতে ইসলামীর সূচনা

জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ) ১৯৩২ সাল থেকে মাসিক "তারজুমানুল কুরআন" পত্রিকার মাধ্যমে এ উপমহাদেশে এ শতাব্দীতে প্রথম ইসলামী আন্দোলনের সূচনা করেন। শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (রঃ)-এর চিন্তাধারার ভিত্তিতে গত শতাব্দীতে সাইয়েদ আহমদ শহীদ (রঃ) ও সাইয়েদ ইসমাঈল শহীদ (রঃ)-এর নেতৃত্বে পরিচালিত ইসলামী আন্দোলনটি ১৮৩১ সালে বালাকোট যুদ্ধে বিপর্যস্ত হওয়ার পর পূর্ণ একশ' বছর এ মানের আর কোন আন্দোলন গড়ে উঠতে পারেনি। ঠিক একশ' বছর পর মওলানা মওদূদী (রঃ) এ আন্দোলনের প্রস্তুতি শুরু করেন।

১৯৪১ সালের আগস্ট মাসে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ৭৫ জন প্রতিনিধি নিয়ে লাহোরে জামায়াতে ইসলামীর সর্বপ্রথম সাংগঠনিক রূপ লাভ করার পূর্বে দশ বছর মওলানা মওদূদী (রঃ) তাঁর মাসিক পত্রিকার মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলনের দৃষ্টিকোণ থেকে মুসলমানদের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সংগঠনগুলোর বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ করেন। এ বিশ্লেষণে তিনি ইসলামী দাওয়াত, কর্মনীতি ও কর্মকৌশলের দিক দিয়ে বিভিন্ন সংগঠনে যে অভাব রয়েছে সেদিকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে "ইসলামী গভর্নমেন্ট কিভাবে কায়েম হয়" এ পর্যায়ে এক বক্তৃতায় মওলানা মওদূদী (রঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ইসলামী আন্দোলনের কর্মপদ্ধতি ব্যাখ্যা করেন। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পরিচালিত মুসলিম লীগের পাকিস্তান আন্দোলনের দিকে ইংগিত করে তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) ইসলামী হুকুমাত কায়েমের জন্য যেভাবে লোক তৈরি করেছিলেন, তেমনি প্রস্তুতি ছাড়া এ আন্দোলনের উদ্দেশ্য কিছুতেই সফল হবে না।

এ বক্তৃতা পুস্তকাকারে প্রচারিত হওয়ার পর একাধারে ৬ মাস পর্যন্ত ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন এবং এর কর্মপদ্ধতি ও কর্মনীতি সম্পর্কে মাসিক পত্রিকার মাধ্যমে তিনি ক্রমাগত আলোচনা চালাতে থাকেন। এক পর্যায়ে তিনি ঘোষণা করেন যে, মুসলমানদের সংগঠনগুলোর কোনটির মধ্যে যদি এসব গুণের সমাবেশ ঘটে, তাহলে তিনি সে দলের সাথেই কাজ করবেন। নতুন দল গঠন করে দলের সংখ্যা বৃদ্ধি দ্বারা মুসলিম শক্তিকে তিনি বিভক্ত করতে চান না বলেও জানালেন।

তাঁর এসব আকুল আবেদনে কোন দল সাড়া না দেয়ায় শেষ পর্যন্ত তিনি ১৯৪১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে "এক সালেহ জামায়াত কি জরুরাত" শিরোনামে তাঁর মাসিক পত্রিকায় নতুন একটা সংগঠন কায়েমের উদ্দেশ্যে লাহোরে এক সম্মেলনের আহ্বান করেন। এ ডাকে যে ৭৫ জন সাড়া দিলেন, তাদেরকে দিয়েই ১৯৪১ সালের ২৫শে আগস্ট জামায়াতে ইসলামীর সংগঠন শুরু হয়।

আদর্শিক ও সাংগঠনিক যে সব বৈশিষ্ট্য নিয়ে জামায়াতে ইসলামী আজ থেকে ৪০ বছর পূর্বে আন্দোলনের ময়দানে অবতীর্ণ হয়, সে সব বৈশিষ্ট্য আজও অন্যান্য

সংগঠন থেকে জামায়াতে ইসলামীর পৃথক সত্তাকে বহাল রেখেছে। দাওয়াত ও কর্মনীতি, ব্যক্তি গঠন পদ্ধতি ও সাংগঠনিক কাঠামো, কর্মপদ্ধতি ও উদ্দেশ্যর দিক দিয়ে আল্লাহ্‌র ফজলে জামায়াতে ইসলামী সর্বত্র আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল।

বর্তমানে উপমহাদেশের যে ৪টি দেশে এ নামে সংগঠন আছে সবটিতেই এ বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ বিভক্ত হওয়ার পর জামায়াতে ইসলামীও দু'ভাগে বিভক্ত হয়। আবার ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর জামায়াতে ইসলামী সংগঠনও এদেশে পৃথকভাবে কায়েম হয়। ওদিকে শ্রীলংকায়ও জামায়াতে ইসলামী নামেই সংগঠন রয়েছে।

জামায়াতে ইসলামীর আন্তর্জাতিক পরিচয়

বর্তমান শতাব্দীতে দু'জন চিন্তাবিদের নেতৃত্বে প্রায় একই সময়ে দুটি দেশে ইসলামী আন্দোলনের সূচনা হয়। এ উপমহাদেশে মওলানা মওদূদী (রঃ)-এর উদ্যোগে 'জামায়াতে ইসলামী' ও মিসরে ইমাম হাসানুল বান্না শহীদ (রঃ)-এর চেষ্টায় 'ইখওয়ানুল মুসলিমুন' নামে এ মহান আন্দোলন শুরু হয়। দুনিয়ার যত দেশে সুসংগঠিত ইসলামী আন্দোলন চলছে সর্বত্রই এ দু'জনের প্রভাব সুস্পষ্ট। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইখওয়ানুল মুসলিমুন ও জামায়াতে ইসলামীই আন্দোলন হিসাবে স্বীকৃত। জামায়াতে ইসলামী এমন একটি নাম, যা যে কোন দেশের ইসলামী আন্দোলনের লোকদের নিকট অতি পরিচিত। জামায়াতে ইসলামীর সদস্য হিসাবে পরিচয়পত্র নিয়ে দুনিয়ার যে কোন দেশের ইসলামী আন্দোলনের সাথে সম্পর্কিত কোন ব্যক্তির কাছে গেলে তাকে অন্তরংগ দ্বীনী ভাই হিসাবেই গ্রহণ করা হয়। এ উপমহাদেশের আর কোন ইসলামী সংগঠনের নাম এভাবে বিশ্বে পরিচিত নয়। তাই 'জামায়াতে ইসলামী' নামটি এখন আন্তর্জাতিক মর্যাদার অধিকারী।

বাংলাদেশ মুসলিম বিশ্ব থেকে ভৌগোলিক দিক দিয়ে বিচ্ছিন্ন হলেও 'জামায়াতে ইসলামী' বিশ্বময় ইসলামী আন্দোলন থেকে মোটেই বিচ্ছিন্ন নয়। 'জামায়াতে ইসলামী' এ উপমহাদেশে ইসলামী আন্দোলনের একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক সংগঠন। গোটা বিশ্বে পাক-ভারত-বাংলার ইসলামী আন্দোলন হিসাবে একমাত্র জামায়াতে ইসলামীই পরিচিত। এ সুন্দর ও সহজবোধ্য নামটির

মাধ্যমে বাংলাদেশের মুসলিম জাতি আজ বিশ্বে সমস্ত ইসলামী আন্দোলনের পরম আত্মীয়।

আয়াতুল্লাহ রূহুল্লাহ খোমিনীর ইসলামী আন্দোলন ইরানে বিজয়ী হওয়ার পর এ আন্দোলন আন্তর্জাতিক পরিচিতি লাভ করে। এ শতাব্দীতে ইরানেই পয়লা ইসলামী হুকুমাত কায়েম হয়। তাই এর স্থিতিশীলতার উপর ইসলামী আন্দোলনের সুনাম অনেকটা নির্ভর করে। আল্লাহ পাক এ হুকুমাতকে সঠিক ইসলামী আদর্শ অনুযায়ী পরিচালনা করার তাওফীক দিলে বিশ্বের সর্বত্র ইসলামী আন্দোলন যথেষ্ট উপকৃত হবে। এর জন্য আমাদের সবারই দোয়া করা উচিত।

জামায়াতের প্রথম বৈশিষ্ট্য ঃ

'বিপ্লবী দাওয়াত'

সমাজ গঠনের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত প্রত্যেক সংগঠনেরই নির্দিষ্ট দাওয়াত থাকে। মানুষকে কোন না কোন একটা লক্ষ্যবিন্দুর দিকে আহ্বান না করলে সংগঠনের উদ্দেশ্য সফল হওয়ার কোন সুযোগই হতে পারে না। যে সব সংগঠন ইসলাম বিরোধী মত ও পথের দিকে আহ্বান জানায় তাদের কথা এখানে উল্লেখ করার দরকার নেই। তাদের সাথে জামায়াতে ইসলামীর তুলনা করা অপ্রাসংগিক। যারা ইসলামের খেদমতের জন্যই জনগণকে সংগঠিত করেন, তাদের সাথেই জামায়াতে ইসলামীর তুলনা চলে।

জামায়াতে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর দাসত্ব, নবীর আনুগত্য এবং সৎ ও যোগ্য লোকের নেতৃত্ব কায়েম করার দাওয়াত দেয় বলেই প্রতিষ্ঠিত অনৈসলামী সরকার ও সর্বপ্রকার কায়েমী স্বার্থের সাথে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। বাতিল শক্তির সাথে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের এ বিপ্লবী দাওয়াতই নবীদের দাওয়াত। এ দাওয়াতের ফলে তাগূতী শক্তি ও কায়েমী স্বার্থ শঙ্কিত না হয়ে পারে না।

وَاتَّقُوْا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوْا الطَّاغُوْتَ.

"আল্লাহকে ভয় কর এবং তাগূত থেকে দূরে থাক"- নবীদের এ বিপ্লবী দাওয়াতের যে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া প্রত্যেক নবীর আন্দোলনে দেখা গেছে জামায়াতে ইসলামীর বেলায়ও ঠিক তাই হচ্ছে।

এ দাওয়াতের আঘাত শুধু ধর্ম বিরোধী, সমাজতন্ত্রী ও জাতীয়তাবাদীদেরকেই আহত করে না, ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি এবং নৈতিকতা বর্জিত সংস্কৃতিসেবীরাও এ দাওয়াতে আতঙ্কিত। তা না হলে জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে এদের সবারই এতটা ক্ষিপ্ত হওয়ার কি কারণ থাকতে পারে?

যদি জামায়াত শুধু ব্যক্তিগত জীবনে পরহিযগারী ও আল্লাহওয়ালা হওয়ার দাওয়াত দিতো, তাহলে বাতিল শক্তির কোন আপত্তিই থাকতো না। যে সব দ্বীনদার ব্যক্তি ও সংগঠন, সমাজ ব্যবস্থা ও রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে ইসলামী বিধান চালু করার কথা বলে না তাদের সাথে তাগূতের কোন বিরোধ নেই। বরং তারা বাতিল সমাজ ব্যবস্থায় মুসলিম খাদেম হয়েই থাকতে বাধ্য হয়। মানুষ রাষ্ট্র ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না। হয় প্রচলিত রাষ্ট্র ব্যবস্থাতে রাযী থাকতে হবে, আর না হয় এ ব্যবস্থা বদলানোর চেষ্টা করতে হবে। নিরপেক্ষ থাকার কোন উপায় নেই। তাই যারা আল্লাহর দাসত্ব ও নবীর আনুগত্যের ভিত্তিতে সমাজ ও রাষ্ট্রের নেতৃত্ব পরিবর্তনের দাওয়াত দেয় না, তারা প্রতিষ্ঠিত বাতিল নেতৃত্বকেই মেনে নেয়। আর বাতিল নেতৃত্বও এ জাতীয় দ্বীনদার লোকদেরকে ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে সময় ও সুযোগ মতো ব্যবহার করতে সক্ষম হয়।

জামায়াতে ইসলামীর দাওয়াতের এটা একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য যে, জামায়াত কোন ধর্ম, সম্প্রদায় ও শ্রেণী বিশেষকে দাওয়াত দেয় না। জামায়াত সকল মানুষকে এক আল্লাহর সৃষ্টি হিসাবে একমাত্র তাঁরই দাসত্ব গ্রহণের দাওয়াত দেয়। জন্মগতভাবে মুসলিম পিতা-মাতার সন্তান হয়েও কোন ব্যক্তি ইসলামের দুশমন হয়ে যেতে পারে। আবার কোন অমুসলিমের সন্তানও আল্লাহর দাসত্ব কবুল করে দ্বীন ইসলামের জন্য জীবন দিতে পারে। তাই জামায়াতের দাওয়াত সবারই প্রতি। যারাই এ দাওয়াতে সাড়া দেয়, তারাই ইসলামের সৈনিক। জামায়াত তাদেরকেই সংগঠিত করতে চায়। জামায়াত মুসলিম জাতীয়তাবাদী দল নয়, ইসলামী আদর্শের পতাকাবাহী দল। এটা কোন সম্প্রদায় বিশেষের দল নয়, ইসলামী আদর্শের অনুসারীদের দল।

জামায়াতের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য ঃ

ইসলামী বিপ্লবের উপযোগী 'ব্যক্তি গঠন পদ্ধতি'

যারা যেভাবেই ইসলামের খেদমত করতে চান, তারা মানুষের মন-মগয ও চরিত্র গঠনের জন্য অবশ্যই চেষ্টা করেন। মাদরাসার ছাত্রদের মধ্যে নিশ্চয়ই এমন কিছু ইসলামী গুণ ও যোগ্যতা সৃষ্টি হয়, যা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে হয় না। মাদরাসার মারফতে যারা দ্বীনের খেদমত করছেন, তারা যে ধরনের লোক তৈরি করার পরিকল্পনা রাখেন, সে জাতীয় লোকই সেখানে পয়দা হয়। তেমনি খানকার মাধ্যমে যারা লোক তৈরি করছেন, তারাও বিশেষ এক ধরনের মন-মগয ও চরিত্র গঠন করছেন। তাবলীগ জামায়াতের চেষ্টায় আর এক ধরনের ব্যক্তি চরিত্র সৃষ্টি হচ্ছে। মাদরাসা, খানকাহ ও তাবলীগের মাধ্যমে যে ইসলামী মন-মগয ও চরিত্র তৈরি হচ্ছে এ কথা নিশ্চয়ই কেউ অস্বীকার করতে পারে না।

কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করে গোটা সমাজ ব্যবস্থাকে আল্লাহর দাসত্ব ও নবীর আনুগত্যের ভিত্তিতে গঠন ও পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে যে ধরনের নেতৃত্ব ও কর্মী বাহিনী সৃষ্টি হওয়া প্রয়োজন, তা ঐ তিন পদ্ধতিতে তৈরি হওয়া স্বাভাবিক নয়। ইসলামী বিপ্লব সাধনের উদ্দেশ্যে যে ধরনের লোক দরকার, তাদের মধ্যে নিম্নলিখিত যোগ্যতা অবশ্যই সৃষ্টি হতে হবে।

১। ঈমানী যোগ্যতা

(ক) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি গতানুগতিক ঈমানই যথেষ্ট নয়। কুরআনে বর্ণিত ও হাদীসে বিশ্লেষিত আল্লাহ পাকের যাবতীয় গুণাবলীতে আল্লাহকে একক ও অদ্বিতীয় বলে বিশ্বাস করাই হলো তাওহীদ। আল্লাহর যাত (সত্তা), সিফাত (গুণাবলী), হুকুক (অধিকার) ও ইখতিয়ার (ক্ষমতা) ইত্যাদির কোন একটিতেও সৃষ্টি জগতের কেউ শরীক নেই বলে বিশ্বাসই হলো তাওহীদ।

(খ) ব্যক্তি ও সমষ্টিগত জীবনে সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ পাককেই একমাত্র ইলাহ, কর্মকর্তা, আইনদাতা ও সার্বভৌম সত্তা মানা যেমন ঈমানের দাবী, তেমনি ঐ সব ক্ষেত্রেই হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে একমাত্র আদর্শ ও অনুসরণযোগ্য মানাই হলো রিসালাতের প্রতি ঈমানের দাবী। রাসূলুল্লাহ (সঃ) যেহেতু আল্লাহর প্রত্যক্ষ ওয়াহী দ্বারা পরিচালিত ছিলেন, সেহেতু তাঁকে নির্ভুল বলে বিশ্বাস করতে হবে এবং যুক্তি বুঝে না আসলেও তাঁকে অন্ধভাবেই অনুসরণ করতে হবে। আর তিনি ছাড়া অন্য কাউকে অন্ধভাবে অনুসরণ করা চলবে না।

আল্লাহর হুকুম পালনের ব্যাপারে রাসূলের তরীকাকেই একমাত্র সঠিক মনে করতে হবে। সাহাবা কিরাম এবং ইমাম ও মুজতাহিদগণকে একমাত্র রাসূল (সঃ)-এর আনুগত্য করার জন্যই মানতে হবে। রাসূল (সঃ)-ই একমাত্র মুত্তাবা' বা আনুগত্যের অধিকারী। রাসূলের তরীকার বিপরীত কারো তরীকা মানা চলবে না। তদুপরি রিসালাতের প্রতি ঈমানের দাবী অনুযায়ী রাসূল (সঃ)-এর সমস্ত জীবনকেই অনুসরণযোগ্য বলে বিশ্বাস করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর আন্দোলনী জীবন এবং রাজনৈতিক ও সামরিক কার্যাবলী যে তাঁর ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক জীবনের মতই অনুকরণযোগ্য একথা বিশ্বাস করাও ঈমান বির-রিসালাতের অঙ্গ।

(গ) আল্লাহর দাসত্ব ও নবীর আনুগত্য সঠিক মানে করতে হলে আখিরাত সম্পর্কেও সঠিক ধারণা থাকতে হবে। মৃত্যুর পর দুনিয়ার জীবনের কার্যকলাপের বদলা দেয়া হবে- এ বিশ্বাস মযবুত থাকলে নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকার অনুসরণ করা সহজ ও সম্ভব। কিন্তু নানা টালবাহানা করে শাফায়াতের ভুল ব্যাখ্যার ভিত্তিতে নাজাত পাওয়ার ভ্রান্ত ধারণা থাকলে ইসলামী চরিত্রের অধিকারী না হয়েও অনেকে বেহেশতের সুখ-স্বপ্ন দেখে। আল্লাহর আদালতে পক্ষপাতিত্ব নেই। যার যেমন আমল, তেমন প্রতিফলই তিনি দেবেন। ফাঁকি দিয়ে পার হয়ে যাওয়ার কোন সুযোগ সেখানে নেই।

২। ইলমী যোগ্যতা

ইসলামী পরিভাষায় 'ইলম' অর্থ হলো ওয়াহীর মারফতে আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর নিকট প্রেরিত জ্ঞান। আল্লাহর কুরআন ও রাসূল (সঃ)-এর সুন্নাহকে

সামগ্রিকভাবে ইলম মনে করতে হবে। কুরআন পাকই হলো এ জ্ঞানের মূল উৎস। কিন্তু এ কুরআনকে রাসূল (সঃ)-এর ২৩ বছরের নবুয়তী জীবন থেকেই বুঝতে হবে। কারণ রাসূল (সঃ)-এর ২৩ বছরের ইসলামী আন্দোলনের জীবনই কুরআনের বাস্তব তাফসীর। কালেমা তাইয়্যেবার দাওয়াত থেকে শুরু করে ইসলামকে পূর্ণরূপে কায়েম করা পর্যন্ত দীর্ঘ ২৩ বছর রাসূল (সঃ)-এর সংগ্রামী ও বিপ্লবী জীবনই হলো আসল কুরআন, বাস্তব কুরআন ও জীবন্ত কুরআন। ঐ আন্দোলন পরিচালনার প্রয়োজনেই যখন যেটুকু দরকার ততটুকু আয়াত হিদায়াত হিসাবে রাসূল (সঃ)-এর কাছে ওয়াহীযোগে পাঠানো হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে কুরআন মজীদ হলো ইসলামী আন্দোলনেরই 'গাইড বুক'।

যারা কুরআন হাকীমকে শুধু একটি ধর্মীয় কিতাব মনে করে, তারা তিলাওয়াতের ছওয়াব ছাড়া এ বিপ্লবী কিতাবের মর্মবাণীর সন্ধান পেতে পারে না। কুরআন যে কাজটি করানোর জন্য নাযিল হয়েছে, সেই ইসলামী আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই এর ইলমের নাগাল পাওয়া সম্ভব। এ দৃষ্টিকোণ থেকে কুরআনী ইলম যারা তালাশ করে, আধুনিক চিন্তাধারা ও মতবাদের মধ্যে কোনটা কুরআন বিরোধী একথা তারাই উপলব্ধি করতে সক্ষম। এ সব মতাদর্শের রাজত্ব খতম করে ইসলামী আদর্শকে মানব সমাজে কায়েম করার জযবা তাদের মধ্যেই সৃষ্টি হয়, যারা আন্দোলনের দৃষ্টিতে কুরআনকে বুঝবার চেষ্টা করে।

কুরআন ও সুন্নাহকে এ বিপ্লবী মনোভাব নিয়ে যারা বুঝবার চেষ্টা করে, তাদের নিকট ইসলামের নামে সমাজে প্রচলিত বহু বিদয়াত, রীতি-নীতি ও রসম-রিওয়াজ যে রাসূল (সঃ)-এর জিহাদী জীবনের সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়, সে কথা সহজেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রাসূল (সঃ)-এর আদর্শ জীবনের সাথে খাপ খায় না এমন যে সব প্রথা ও পদ্ধতি ইসলামের লেবাস পরে মুসলিম সমাজকে জিহাদ বিমুখ করে রেখেছে, সে সব থেকে আত্মরক্ষা করা তাদের পক্ষেই সম্ভব। ইসলামের এ ইলমী যোগ্যতা অর্জনের চেষ্টা না করলে বহু তাফসীর, হাদীস ও ফিকহার চর্চা করা সত্ত্বেও ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থাকতে হবে।

৩। আমলী যোগ্যতা

আমল মানে কাজ। ইসলামী পরিভাষায় আমল অর্থ হলো আল্লাহ ও রাসূল (সঃ)-এর আদেশ পালন করা এবং তাঁদের নিষিদ্ধ সব কিছু থেকে বিরত থাকা। আজকাল মুসলিম সমাজে 'আমল করার' একটা অদ্ভুত অর্থ প্রচলিত আছে। হালাল রূযী তালাশ করার জন্য বাস্তবে চেষ্টা না করে কোন দোয়া সোয়া লাখ বার বসে বসে পড়ার নাম দেয়া হয়েছে 'রিযিকের আমল'। অর্থাৎ কাজ না করার নাম রাখা হয়েছে আমল। রূযী তালাশ করার সময় আল্লাহর কাছে দোয়া করতে থাকতে হবে যাতে আল্লাহর সাহায্য পাওয়া যায়। কিন্তু যে জাতি কাজ না করার নাম দিয়েছে আমল, সে জাতির উন্নতির সমস্ত পথই বন্ধ।

আমলের ব্যাপারে সবচেয়ে মারাত্মক রোগ হলো ধর্মীয় গণ্ডির মধ্যে আমলকে সীমাবদ্ধ মনে করা। মানব সমাজে আল্লাহর আইন চালু করে যুলুম বন্ধ করা ও ইনসাফ কায়েম করার চেষ্টাকে আমল মনে করা হয় না। মানুষের উপর মানুষের রচিত মনগড়া আইনের ফলে মানব সমাজে যে অশান্তি বিরাজ করছে, তা দূর করে মানব জাতিকে আল্লাহর দেয়া বিধানের মাধ্যমে দুনিয়ার শান্তিময় জীবন ও আখিরাতে মুক্তির পথ দেখানোর দায়িত্ব পালনের জন্য মুসলিম জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে বলে আল্লাহ পাক কুরআনে ঘোষণা করেছেন। এ বিরাট দায়িত্ব পালন করা যে আমলের প্রধান দিক সে কথা মুসলমানরাই ভুলে গেছে।

নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত, যিকির, তিলাওয়াত, ওয়াযিফা, মুরাকাবা ইত্যাদি কতক ধর্মীয় কাজের মধ্যেই আমলকে সীমাবদ্ধ মনে করা হচ্ছে। আল্লাহর যমীনে আল্লাহর বিধানকে চালু করার মাধ্যমে আল্লাহর খিলাফতের দায়িত্বকে আমলের হিসাবেই আনা হচ্ছে না। অথচ খিলাফতের দায়িত্ব পালনের জন্যেই মানুষকে পয়দা করা হয়েছে বলে কুরআনে ঘোষণা রয়েছে।

আমি সমস্ত মুখলিসীনে দ্বীনের খেদমতে আরয করতে চাই যে, প্রচলিত মাদরাসা, খানকাহ, তাবলীগ ও ওয়াযের মাধ্যমে উপরে বর্ণিত ঈমানী, ইলমী ও আমলী যোগ্যতা সৃষ্টি হচ্ছে কিনা তা ইনসাফের সাথে বিচার করুন। সব কারখানা সব রকম জিনিস পয়দা করে না। প্রত্যেক কারখানায় ঐ জিনিসই তৈরি হয়, যে জিনিস তৈরি করার উদ্দেশ্যে সে কারখানা কায়েম করা হয়। মাদরাসা ও খানকায় যদি ইকামাতে দ্বীনের যোগ্য লোক তৈরির কর্মসূচীই না থাকে, তাহলে সেখানে ইসলামের অন্যান্য যত গুণই সৃষ্টি হোক, বাতিলকে

উৎখাত করে দ্বীনে হককে কায়েম করার মতো ঈমানী, ইসলামী ও আমলী যোগ্যতা কিছুতেই সৃষ্টি হতে পারে না।

জামায়াতে ইসলামীর বৈশিষ্ট্য এখানেই। জামায়াতের বিপ্লবী দাওয়াত নিয়ে কর্মীরা যখন ময়দানে কাজ করতে থাকে, তখন ইসলাম বিরোধী শক্তি ও ছোট-বড় সব রকমের কায়েমী স্বার্থের সাথে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত শুরু হয়ে যায়। ফলে ইকামাতে দ্বীনের জন্য যে বলিষ্ঠ ঈমান প্রয়োজন, কুরআনকে বুঝাবার জন্য যে জাতীয় ইলম দরকার এবং তাগূতের সাথে মুকাবিলা করার জন্য যে ধরনের আমলী যোগ্যতা অপরিহার্য, সে ঈমান, ইলম ও আমল তাদের মধ্যে পয়দা হতে থাকে। পানিতে হাবুডুবু না খেয়ে যেমন সাঁতারের যোগ্য হতে পারে না, তেমনি ইসলামী আন্দোলনের ময়দানে না নামলে এ জাতীয় ঈমানী, ইলমী ও আমলী যোগ্যতা হাসিল হতে পারে না।

নবী করীম (সঃ)-এর ইসলামী আন্দোলন এ কথার উজ্জ্বলতম সাক্ষী। সমস্ত নবীর জীবনেই একথা সত্য। নবীগণ শ্রেষ্ঠতম মানুষ হওয়া সত্ত্বেও এবং মানুষ হিসাবে তাঁদের উন্নত চরিত্র দুশমনদের স্বীকার করতে বাধ্য হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের দাওয়াতের বিরুদ্ধে কায়েমী স্বার্থ ও তাগূতী শক্তি এমন মারমুখী হলো কেন? আর এ যুগের তাগূত ও বাতিল শক্তি মাদরাসা, খানকাহ, তাবলীগ ও ওয়াযেব বিরুদ্ধে তেমনি মারমুখী নয় কেন?

যে কেউ নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে চিন্তা করলে এ প্রশ্নের জওয়াব সহজেই পাবে। মাদরাসা, খানকাহ ও তাবলীগের দ্বারা দ্বীনের বড় খেদমত হওয়া সত্ত্বেও এসব প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচীতে ইকামাতে দ্বীনের কোন প্রোগ্রাম নেই। খেদমতে দ্বীনের প্রোগ্রাম দ্বারা যে জাতীয় মন-মগয ও চরিত্র সৃষ্টি হয়, তা ইকামাতে দ্বীনের জন্য মোটেই যথেষ্ট নয়। প্রচলিত মাদরাসা সিলেবাস, খানকার তালকীনে এবং তাবলীগ জামায়াতের চিল্লায় অনেক ইসলামী গুণের সৃষ্টি হয় বটে, কিন্তু 'জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহ' ও ইকামাতে দ্বীনের জন্য প্রয়োজনীয় ঈমানী, ইলমী ও আমলী যোগ্যতা সৃষ্টি হয় না। এ জাতীয় যোগ্যতা সৃষ্টির কোন পরিকল্পনাই সেখানে নেই। তাই ইসলাম বিরোধী শক্তি মাদরাসা, খানকাহ ও তাবলীগকে তাদের জন্য বিপজ্জনক মনে করে না। তাদের সাথে তাগূতী শক্তির কোন বিরোধ নেই অথচ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে ঐ শক্তির চরম বিরোধ ছিল।

জামায়াতে ইসলামী ব্যক্তি গঠনের জন্য ঐ স্বাভাবিক পদ্ধতিই গ্রহণ করেছে যা আল্লাহর রাসূলগণ করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে জামায়াতে ইসলামী ঈমান, ইলম ও আমলের এক ব্যাপক আন্দোলন। ইসলামের প্রতি সত্যিকার ঈমান, কুরআন ও সুন্নাহর সঠিক ইলম ও খাঁটি মুসলিমের ব্যাপক আমলের এক মহান প্রচেষ্টারই নাম "জামায়াতে ইসলামী"।

জামায়াতে ইসলামীর তৃতীয় বৈশিষ্ট্যঃ

'তাকওয়া ভিত্তিক সংগঠন'

অন্যান্য রাজনৈতিক দল 'কমিটি গঠনের' মাধ্যমে সংগঠন গড়ে তোলে। যারা দল গঠনের উদ্যোগ নেন, তারা সংগঠনের আদর্শ ও উদ্দেশ্য ঘোষণা করার পর যখন কিছু লোক সে দলে যোগদান করতে রাযী হন, তখন এ লোকদেরকে নিয়েই একটি কমিটি গঠন করা হয়। সভাপতি, সহ সভাপতি, সেক্রেটারী ও অন্যান্য পদ বন্টন করে গ্রাম, ইউনিয়ন, থানা, জেলা ও জাতীয় পর্যায়ে কমিটি গঠন করা হয়ে থাকে। লোক তৈরি করার কোন পদ্ধতি ছাড়াই রেডীমেড লোক দ্বারা সংগঠন গড়ে তোলা হয় বলে এ জাতীয় দলের মধ্যে সহজেই ভাংগন দেখা দেয়। এক দল ভেংগে একই নামে কয়েক দল হয়। জামায়াতে ইসলামী এ প্রচলিত নিয়মে সংগঠন করে না।

জামায়াতের সংগঠনে লোক ভর্তি করার যে নিয়ম রাখা হয়েছে, তা ইকামাতে দ্বীনের উপযোগী লোক যোগাড় করার জন্য অত্যাবশ্যক। ইতঃপূর্বে ঈমানী, ইলমী ও আমলী যোগ্যতা সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, তা ইসলামী আন্দোলনের বাইরে তৈরি হওয়া সম্ভব নয় বলে প্রথমেই কোন লোককে জামায়াতের রুকন বা সদস্য হিসাবে ভর্তি করা হয় না। মাদরাসা পাস আলিম হোক আর খানকাহ থেকে তরবিয়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তি হোক, সবাইকে প্রথমে জামায়াতের সহযোগী সদস্য হিসাবে গ্রহণ করা হয় এবং তাকে নিয়মিত কর্মী হয়ে নিজেকে ইসলামী আন্দোলনের প্রোগ্রাম অনুযায়ী গড়ে উঠবার সুযোগ দেয়া হয়।

কিছুদিনের মধ্যেই তিনি বুঝতে পারেন যে, এ পথে চলার জন্য ব্যক্তি জীবন ও পারিবারিক জীবনে ইসলামের দাবী অনুযায়ী অনেক পরিবর্তন আনতে হবে। রুযী রোযগারে সূক্ষ্মভাবে হালাল-হারামের হিসাব করতে হবে। বিবি ও মেয়েদেরকে পর্দা পালন করতে হবে। মেয়েদেরকে এমন স্কুল-কলেজে পড়াশোনা

করানো যাবে না, যেখানে ছেলেদের সাথে এক ক্লাসে বসতে হয়। মাদরাসার প্রিন্সিপাল হিসাবে ছাত্র সংখ্যা ও অন্যান্য ব্যাপারে মিথ্যা রিপোর্ট দেয়া যাবে না। ব্যবসায়ী হিসাবে আয়কর ফাঁকী দেয়ার জন্য মিথ্যা হিসাব দাখিল করা যাবে না। সুদের সাথে কোন সম্পর্ক রাখতে পারবে না। সুদে টাকা ধার নিয়ে বিল্ডিং বানানো যাবে না। বাস্তব জীবনে এ জাতীয় অনেক কিছু থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে তাকওয়ার পথে এগুবার যাদের হিম্মত হয়, তারাই পর্যায়ক্রমে জামায়াতের সদস্যপদ লাভ করে।*

সদস্য হওয়ার পর দ্বীনী যিন্দেগীতে আরও অগ্রগতি হচ্ছে কি না তার নিয়মিত তদারক করার ব্যবস্থা রয়েছে। নির্দিষ্ট কতক বিষয়ে নিয়মিত মাসিক রিপোর্ট পর্যালোচনা করে দেখা হয় যে, অন্তত সদস্যের নিম্নতম মান বহাল আছে কি না। কুরআনের তাফসীর পড়া, হাদীস শেখা, ইসলামী সাহিত্য পড়া, জামায়াতে নামায আদায় করা ও রোজ আত্মসমালোচনা করার মাধ্যমে দ্বীনী উন্নতির চেষ্টা চলছে কি না তারও তদারক করা হয়। নিম্নতম মান বহাল না থাকলে সদস্যপদ বাতিল করা হয়। এভাবেই 'ইসলামী ক্যাডার' গড়ে ওঠে। এ ক্যাডার ভিত্তিক সংগঠন ছাড়া কোন আদর্শই কায়েম করা সম্ভব নয়।

ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্বশীল কর্মী হিসাবে সদস্যদের দাওয়াতী কাজের হিসাব নেয়া হয়। আল্লাহর বান্দাদেরকে ইকামাতে দ্বীনের এ আন্দোলনে শরীক করার জন্য নিয়মিত কাজ করছেন কি না তারও রিপোর্ট নেয়া হয়।

জামায়াতে ইসলামীর এ তৃতীয় বৈশিষ্ট্যটি তাকওয়ার যিন্দেগী হাসিল করার জন্য বিশেষ জরুরী। মাদরাসার ডিগ্রী, ওয়াযের যোগ্যতা, লেখার প্রতিভা ইত্যাদি সদস্য হওয়ার জন্য কোন মাপকাঠি নয়। বাস্তবে ইসলামের বিধান পালন ও অপরকে এ পথে আনার প্রবল আগ্রহ যার মধ্যে আছে, সে লেখাপড়া না জানলেও জামায়াতের সদস্য হতে পারে। কোন নামকরা ব্যক্তি, কোন দলের নেতা বা কোন ধনী লোক হলেও জামায়াতের সদস্য হিসাবে ভর্তি করা হয় না। কারণ যে মহান উদ্দেশ্যে জামায়াত গঠিত, সে উদ্দেশের জন্য যেসব দ্বীনী যোগ্যতা দরকার, তা সৃষ্টি করতে হলে এ নীতি পালন করা ছাড়া উপায় নেই। অবশ্য সদস্য হওয়ার জন্য যেটুকু শর্ত রাখা হয়েছে, তা পূর্ণ মুসলিমের নিম্নতম মান মাত্র। ইসলামী সমাজ চালু নেই বলে এটুকু শর্তই কঠিন ও কষ্টকর মনে হয়।

---

* বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য "ইসলামী দাওয়াত ও কর্মনীতি" এবং "সংগঠন পদ্ধতি" বই দুটো পড়তে পারেন।

জামায়াতের চতুর্থ বৈশিষ্ট্যঃ

'নেতৃত্ব সৃষ্টির পদ্ধতি'

জামায়াতে ইসলামীর সদস্যদের গোপন ভোটেই জামায়াতের সকল পর্যায়ের নেতা নির্বাচিত হয়। ইউনিয়ন ও উপজেলা জামায়াত, জেলা জামায়াত ও কেন্দ্রীয় জামায়াতের আমীর ও মজলিসে শূরার সদস্যগণ জামায়াতের সাধারণ সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। এ নির্বাচনের বেলায় জামায়াতের যেসব বৈশিষ্ট্য অন্যান্য সংগঠন থেকে জামায়াতের পার্থক্য নির্ণয় করে, তা ইসলামের নীতিরই বাস্তব প্রয়োগ।

(১) কোন পদের জন্য কারো প্রার্থী হওয়ার অধিকার নেই। যদি কেউ আকারে-ইংগিতেও কোন পদের আকাঙ্ক্ষী বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে তাকে অযোগ্য মনে করা হয়। জামায়াতের গঠনতন্ত্রের ৬৫ নং ধারার শেষাংশে আছে যে, "প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কোন পদের জন্য আকাঙ্ক্ষিত হওয়া বা ইহার জন্য চেষ্টা করা উক্ত পদে নির্বাচিত বা নিযুক্ত হওয়ার জন্য অযোগ্যতা হিসাবে বিবেচিত হইবে।"

(২) নির্বাচনে কোন প্রতিযোগিতার সুযোগ নেই। অন্যান্য সংগঠনে দেখা যায় যে, কোন পদের জন্য বিভিন্ন প্রস্তাবক নিজ নিজ পছন্দসই ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করে। তারপর প্রস্তাবিত ব্যক্তিদের মধ্যে নির্বাচনী প্রতিযোগিতা চলে। প্রস্তাবকগণ ও তাদের সমর্থকগণ নিজ নিজ মনোনীত ব্যক্তির পক্ষের নির্বাচনী প্রচারাভিযান চালান। এতে সংগঠনের মধ্যে ব্যক্তিভিত্তিক উপদলের সৃষ্টি হয়। জামায়াতের নির্বাচনে কেউ প্রার্থী হতে পারেন না। তাই কেনভাসিংয়েরও সুযোগ নেই। সদস্যগণ যাকে খুশী ভোট দেন এবং যার পক্ষে অধিকাংশ ভোট পড়ে, তিনিই নির্বাচিত বলে ঘোষণা করা হয়। এ বৈশিষ্ট্যের কারণেই জামায়াতের মধ্যে নেতৃত্বের কোন্দল বা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে কোন সাংগঠনিক বিরোধ সৃষ্টি হয় না।

(৩) জামায়াতের গঠনতন্ত্রে নেতৃত্বের জন্য যেসব গুণাবলীর উল্লেখ রয়েছে, তা প্রধানত দ্বীনী যোগ্যতা। কোন ব্যক্তির রাজনৈতিক প্রভাব, আর্থিক শ্রেষ্ঠত্ব বা উচ্চ শিক্ষাগত ডিগ্রী জামায়াতের কোন পদের জন্য যোগ্যতার মাপকাঠি বলে

গণ্য নয়। অবশ্য দ্বীনী যোগ্যতার সাথে নেতৃত্বের বুনিয়াদী যোগ্যতাও নেতা নির্বাচনের সময় বিবেচনা করা হয়।

(৪) অন্যান্য দলে দেখা যায় যে, নেতৃত্বের আকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদেরকে কোন না কোন পদ দিয়ে দলে রাখার চেষ্টা করতে হয়। জামায়াতে কোন লোককে পদ দিয়ে মানানোর প্রয়োজন হয় না। তাই পদলোভীদের দ্বারা উপদল সৃষ্টি হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে না।

(৫) জামায়াতের সর্বস্তরে পারস্পরিক সমালোচনা ও সংশোধনের এমন সুব্যবস্থা রয়েছে যার ফলে কর্মী ও দায়িত্বশীলদের সম্পর্ক এবং কর্মীদের পারস্পরিক সম্পর্ক বিনষ্ট হয়ে দলাদলির পর্যায়ে বা ঝগড়ার পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে না। জামায়াতের পরিভাষায় এ ব্যবস্থাকে 'মুহাসাবা' বলা হয়।

এ কারণেই জামায়াতে ইসলামীতে কোন হিরোওয়ারশীপ বা বীরপূজা নেই। জামায়াতের নিকট আসল হিরো একমাত্র শেষ নবী। এ আসল হিরোকে যারা অনুসরণ করে, তাদের অনুসরণের মান অনুযায়ী যারা যে মর্যাদার যোগ্য, জামায়াত তাদেরকে সে সব মর্যাদারই অধিকারী মনে করে। সে হিসাবে সাহাবা কিরাম সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী। তাঁদের মধ্যে প্রথম চার খলীফা অন্যান্য সাহাবীর তুলনায় অধিক মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য। আবার এ চার জনের মধ্যে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) শ্রেষ্ঠতম। এভাবেই তাবেয়ীগণের মর্যাদা সাহাবাগণের পরই এবং তাবে-তাবেয়ীনের মর্যাদা তাবেয়ীদের পর। এর পরবর্তীদের বেলায়ও রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অনুসরণের মান অনুযায়ীই বিভিন্ন লোকদের মর্যাদা বিভিন্ন হতে বাধ্য।

জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ) এ শতাব্দীতে এতবড় একটা ইসলামী আন্দোলন দুনিয়ায় চালু করে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করা সত্ত্বেও জামায়াতে ইসলামী কোন দেশে তাঁর জন্ম বার্ষিকী বা মৃত্যুবার্ষিকী পালন করছে না। এর কারণ এটাই যে, জামায়াত নেতা-পূজা করে না। জামায়াত মানুষকে ঐ পূর্ণাঙ্গ ইসলামের দিকে ডাকে, যে ইসলাম এ যুগের মানুষ ভুলে গিয়েছিল। আল্লাহর রাসূলের আনীত দ্বীন ইসলামকে আসল রূপে মওলনা মওদূদী (রঃ) এ যুগে নতুন করে পেশ করা সত্ত্বেও জামায়াতে ইসলামী মাওলানাকে হিরো বানায়নি। মওলানা মওদূদীর ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার দিকে মানুষকে আকৃষ্ট করাই যদি জামায়াতের উদ্দেশ্য

হতো, তাহলে যে যে দেশে জামায়াতে ইসলামীর সংগঠন আছে, সেসব দেশেই মওলানার জন্ম ও মৃত্যু দিবস পালন করা প্রয়োজন মনে করা হতো।

জামায়াতের নিকট একমাত্র আদর্শ নেতা হলেন বিশ্বনবী (সাঃ)। তাঁকে সর্বাবস্থায় সর্বক্ষেত্রে অনুসরণ করাই জামায়াতের লক্ষ্য। তাই জামায়াতের নেতা নির্বাচনের বেলায় তাদেরকেই অধিকতর যোগ্য মনে করা হয়, যাদেরকে অন্যের তুলনায় রাসূলের বেশী অনুসারী বলে বুঝা যায়।

জামায়াতের পঞ্চম বৈশিষ্ট্য ঃ

'ক্ষমতা দখলের রাজনীতি করে না'

সাধারণত রাজনীতি করার উদ্দেশ্য হলো সরকারী ক্ষমতা দখল করে, দেশের উপর প্রাধান্য বিস্তার করা ও পার্থিব সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা ভোগ করা। যারা এ জাতীয় রাজনীতি করে তারা কোন না কোন ইস্যুকে ভিত্তি করে বিরাট হৈ-হাঙ্গামা সৃষ্টি করে সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জনের চেষ্টা করে। এরা নির্বাচনের সময় বিভিন্ন প্রকার কৌশল অবলম্বন করে জনগণকে বিভ্রান্ত করতে চেষ্টা করে। এমনকি সকল প্রকার নির্বাচনী দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে হলেও জিতবার জন্য মরিয়া হয়ে লেগে যায়।

আর যারা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী, তারা রাজনৈতিক পরিবেশকে ঘোলাটে করার জন্য সর্বপ্রকার কূটকৌশলের আশ্রয় নেয় এবং দেশে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করার চেষ্টা করে। জনগণের সমর্থন নিয়ে তাদের উদ্দেশ্য সফল হতে পারে না বলেই তারা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই বিশ্বাসী নয়। তারা বন্দুকের নালীতেই বিপ্লব আসে বলে বিশ্বাস করে। গণতন্ত্রের সুযোগ তারা বাধ্য হয়ে গ্রহণ করলেও গণতন্ত্র তাদের আদর্শের সাথে খাপ খায় না।

জামায়াত ইসলামী হাংগামার রাজনীতি ও অস্ত্রের বিপ্লবে বিশ্বাসী নয়। শেষ নবী (সঃ) বিপ্লবের যে পথ দেখিয়ে গেছেন, সে পথকে জামায়াত একমাত্র সঠিক পথ মনে করে। ১৩ বছর তিনি মক্কায় ইসলামী আন্দোলনের সংগ্রাম-যুগে যে পদ্ধতিতে কাজ করেছেন তাই জামায়াতের নিকট আদর্শ। তিনি কোন হাংগামী রাজনীতি করেননি। বিরোধীদের হাজারো যুলুম-নির্যাতন সত্ত্বেও চোরাপথে বিপ্লব করার চেষ্টা করেননি।

জামায়াতে ইসলামী বিশ্বাস করে যে, ইসলামী সরকার চালানোর যোগ্য কর্মীবাহিনী তৈরি হলে আল্লাহপাক সরকারী দায়িত্ব দেয়ার পথ করে দেবেন। এ বিষয়ে কুরআনে সুস্পষ্ট ওয়াদা রয়েছে -

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الاَرْضِ (النور-٥٥)

"আল্লাহ ওয়াদা করছেন যে, তোমাদের মধ্যে যারা সত্যিকার ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে তাদেরকে আমি নিশ্চয়ই দুনিয়ার কর্তৃত্ব দান করবো।" (সূরা নূর-৫৫ আয়াত)

তাই জামায়াতে ইসলামীর আসল কাজ হলো একদল খাঁটি মু'মিন ও সৎ কাজের যোগ্য লোক তৈরি করা। এমন ধরনের প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোক তৈরি হলে জামায়াতে ইসলামীর হাতে ক্ষমতা তুলে দেয়ার দায়িত্ব আল্লাহর। সুতরাং ক্ষমতা দখলের জন্য পেরেশান হওয়া জামায়াত মোটেই প্রয়োজন মনে করে না। এই জন্যই ক্ষমতালিপ্সুরা যে জাতীয় হাংগামী রাজনীতি করে থাকে জামায়াত কখনও তা করে না।

জামায়াত যে বিপ্লব চায়, তা জনগণকে বুঝিয়ে গণসমর্থন নিয়ে স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক পথেই করা উচিত বলে মনে করে। অস্বাভাবিক পথে বা পেছন দরজা দিয়ে বিপ্লব করলে তা কখনো স্থায়ী হতে পারে না এবং এ পদ্ধতিতে আদর্শ কায়েম করা সম্ভব হয় না। যে সব লোক আদর্শের নাম নিয়ে নিজেদের নেতৃত্ব কায়েম করতে চায়, তারা আদর্শ কায়েমের যোগ্যই নয়। যারা আদর্শ কায়েম করার জন্য নিজেদেরকে বিলিয়ে দিতে চায়, তাদের হাতেই আদর্শ কায়েম হয়। জামায়াতের সাথে যারা সংশ্লিষ্ট, তারা জামায়াতের এ বৈশিষ্ট্যের জন্য আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞ।

জামায়াতের ষষ্ঠ বৈশিষ্ট্য ঃ
'কর্মীদের আর্থিক কুরবানীই বাইতুল মালের উৎস'

সাধারণত দেখা যায় যে, রাজনৈতিক দল কর্মীদের কাছ থেকে চাঁদা তোলে না। দলীয় তহবিলে কর্মীদের কাছ থেকে নিয়মিত চাঁদা নেয়ার রেওয়াজই নেই। পার্টির ফান্ড থেকে টাকা খরচ করেই কর্মীদেরকে কাজে লাগান হয়। অনেক পার্টিতে ধনী ব্যক্তিরাই দলীয় নেতা হন এবং তার টাকাতেই কর্মীরা কাজ করে। জামায়াতে ইসলামী এর সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। জামায়াতের সদস্য ও কর্মীদেরকে তাদের মাসিক আয়ের একটা নির্দিষ্ট অংশ প্রতি মাসে নিয়মিত জামায়াতের বাইতুলমালে দান করতে হয়। এছাড়া সদস্য হওয়া তো দূরের কথা কর্মী হিসেবে কেউ গণ্য হতে পারে না।

আল্লাহর দ্বীনের জন্য জান ও মাল খরচ করার যে নির্দেশ কুরআন পাকে আছে, তার উপর কর্মীদেরকে আমল করার জন্য জামায়াত গুরুত্বের সাথে তাকিদ দেয়। এছাড়াও যারা জামায়াতের সহযোগী ও শুভাকাঙ্ক্ষী তাদের কাছ থেকেও কর্মীরা নিয়মিত মাসিক সাহায্য আদায় করে।

জামায়াতের তহবিলের নাম হলো বাইতুলমাল। এতে দান করাটা আল্লাহর পথে মাল খচর করার মর্যাদা রাখে বলে এ দানকে চাঁদা বলা হয় না। এ দানকে দাতাও অন্যান্য দলের চাঁদার মতো মনে করে না। নিজের প্রয়োজনের বাইরে অন্য কাজের জন্য দান করাকেই চাঁদা বলা হয়। কিন্তু আল্লাহর পথে যা খরচ করা তা প্রকৃপক্ষে আল্লাহর ব্যাংকে নিজের জন্য জমা রাখা হয়। আল্লাহ পাক এ মালকে 'করযে হাসানা' বলে ঘোষণা করেছেন এবং আখিরাতে বহুগুণ বাড়িয়ে এ ধার শোধ করার ওয়াদাও করেছেন। সুতরাং যারা আখিরাতে বেশী লাভ পেতে চায়, তারা দুনিয়ার মাল আল্লাহর ঐ ব্যাংকে বেশী পরিমাণেই জমা রাখার চেষ্টা করে। চাঁদার নিয়তে অল্প করে দেয়াকে তারা নিজের জন্যই ক্ষতিকর মনে করে। যে যত বেশী মাল এপথে কুরবানী দিতে পারে, ততই আল্লাহর সন্তুষ্টি বেশী পাওয়া যাবে বলে কর্মীরা বিশ্বাস করে।

কর্মীদের এ দানই জামায়াতের বাইতুলমালের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। এ সম্পদকে আল্লাহর দ্বীনের কাজে খরচ করতে গিয়ে দায়িত্বশীলদেরকে খুব হিসাব

করতে হয়। এ সাবধানতা সত্ত্বেও সকল পর্যায়েই বাইতুলমালের আয় ও ব্যয়ের হিসাব অডিট করার ব্যবস্থা রয়েছে।

জামায়াতের সপ্তম বৈশিষ্ট্য ঃ

'বিরোধীদের প্রতি জামায়াতের আচরণ'

জামায়াতে ইসলামী যেহেতু কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক ব্যক্তি ও সমাজ জীবনকে গড়ে তুলতে চায়, সেহেতু বিভিন্ন বিরোধী শক্তির পক্ষ থেকে জামায়াতের বিরুদ্ধে অনেক কিছু করা হয়। অনৈসলামী সরকারের পক্ষে জামায়াতে ইসলামীকে ভাল চোখে দেখা কিছুতেই সম্ভব নয়। ধর্ম-নিরপেক্ষতাবাদী ও সমাজতন্ত্রীরা জামায়াতে ইসলামীকে তাদের আদর্শের সবচেয়ে বড় শত্রু মনে করাই স্বাভাবিক। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কায়েমী স্বার্থ জামায়াতকে তাদের স্বার্থের জন্য বিপজ্জনক মনে করে নিজ নিজ পন্থায় বিরোধিতা করে থাকে। এমনকি এক শ্রেণীর ধর্মীয় মহলও জামায়াতের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়ে ইসলাম বিরোধী শক্তিকে পরোক্ষভাবে সাহায্য করে থাকে।

সরকার বা কায়েমী স্বার্থের পক্ষ থেকে জামায়াতের বিরোধিতা হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। জামায়াত যতই জনপ্রিয় হবে, ততই তাদের বিরোধিতা বাড়বে। এটাকে জামায়াত মোটেও অপ্রত্যাশিত মনে করে না। তেমনি ইসলাম বিরোধী মতাদর্শের সমর্থকদের পক্ষ থেকেও বিরোধিতা হবেই। এসব বিরোধিতা নিয়ে জামায়াত মাথা ঘামায় না। তারা জামায়াতকে যতই গালাগালি করুক জামায়াত তাদের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হয় না। তারা যে সব মিথ্যা অপবাদ দেয় জামায়াত প্রয়োজন মনে করলে যুক্তির দ্বারা সেগুলো খণ্ডন করে।

জামায়াতের বিরুদ্ধে যারা অভদ্র ও অশালীন ভাষা প্রয়োগ করে জামায়াত তাদেরকে করুণার পাত্র মনে করে। জামায়াতের দাওয়াত, আদর্শ ও কর্মসূচীর বিরুদ্ধে বেচারাদের কিছুই বলার সাধ্য সেই বলে বেসামাল হয়ে গালাগালি করে মনের ঝাল মেটনোর চেষ্টা করে। আল্লাহর মেহেরবানীতে জামায়াতে ইসলামীর লোকেরা গালি দেয়ার যোগ্য নয়। তারা ইসলামের দুশমনদের গালি খেয়েও তাদের হিদায়াতের জন্য দোয়া করে।

ইসলামী আন্দোলনের বিরোধীদের ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর যে নীতি ছিল জামায়াতে ইসলামী সে নীতিই অনুসরণ করছে। আল্লাহ্ পাক তাঁর রাসূলকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, রাসূল যেন বিরোধীদের বাধা- বিপত্তির পরওয়া না করে নিজের দায়িত্ব পালন করতে থাকেন এবং বিরোধীদেরকে সামলানোর দায়িত্ব যেন আল্লাহর হাতেই ছেড়ে দেন।

وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِيْنَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيْلاً.

"মিথ্যা প্রতিপন্নকারী ও অর্থশালীদেরকে আমার হাতে ছেড়ে দাও"

(সূরা মুযযাম্মিল-১১)

ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيْدًا.

"আমি যাকে একাই সৃষ্টি করেছি তাকে আমার হাতে ছেড়ে দাও।"

(সূরা মুদ্দাচ্ছির-১১)

এদ্বারা স্পষ্ট বুঝা গেল যে, বিরোধীদেরকে আল্লাহ্ নিজেই শায়েস্তা করতে চান। আল্লাহ্ বলতে চান যে, যারা ইসলামী আন্দোলনের বিরোধিতা করছে তারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহরই বিরোধী। সুতরাং তাদের বিচার করার ভাব আল্লাহর হাতেই তুলে দেয়া উচিত। ইসলামের কাজে যারা আত্মনিয়োগ করেছে, তাদের আপন দায়িত্বের প্রতিই মনোযোগী হওয়া কর্তব্য। বিরোধীদের ব্যাপারে আল্লাহর উপর নির্ভর করাই যথেষ্ট।

জামায়াতে ইসলামী আল্লাহ্ পাক ও নবী করীম (সঃ)-এর এ নীতিই নিষ্ঠার সাথে পালন করার চেষ্টা করছে। ১৯৮১ সালের মার্চ মাস থেকে মে মাসের শেষ পর্যন্ত ভারত ও রুশপন্থী কতক মুক্তিযোদ্ধা জামায়াতে ইসলামীকে খতম করার জন্য উচ্ছৃঙ্খল আচরণে লিপ্ত হয়েছিল এবং চরম বেআইনী পন্থায় জামায়াতের উপর বহু জায়গায় হামলা করা সত্ত্বেও সরকার যেভাবে নীরব ভূমিকা পালন করেছে, তাতে মনে হয়েছিল যে, দেশে কোন সরকার নেই। এমনকি এক মুক্তিযোদ্ধা নেতা জামায়াতকে বেআইনী ঘোষণা করার ধৃষ্টতা পর্যন্ত প্রদর্শন করেছে।

এ কঠিন পরিস্থিতিতে জামায়াত অত্যন্ত ধৈর্য্যের সাথে সংঘর্ষ এড়িয়ে চলেছে এবং শত উস্কানি সত্ত্বেও জামায়াত কর্মীদেরকে নিরস্ত রেখেছে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর পরিচালিত ইসলামী আন্দোলনের সংগ্রাম যুগে (মক্কায় অবস্থানকালে) বিরোধীদের অন্যায় বাড়াবাড়িকে সহ্য করা ও তাদেরকে আল্লাহর হাতে ছেড়ে দেয়ার যে নীতি ছিল তাই জামায়াত পালন করছে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে আল্লাহর রাসূল যে দোয়া করতেন, সে দোয়াই কর্মীরা করেছে।

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِىْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ.

"হে আল্লাহ আমরা তোমাকে এদের ঘাড়ে স্থাপন করলাম এবং এদের ক্ষতি থেকে তোমারই আশ্রয় গ্রহণ করলাম।"

একাগ্রতার সাথে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করলে বিরোধীদের শত শত লক্ষ ঝম্ফ সত্ত্বেও ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের মনে আর কোন আতঙ্ক থাকে না। মূসা (আঃ) কে হত্যার হুমকি দেয়ার সাথে সাথে ফেরাউনের মুখের উপর তিনি নির্ভয়ে বলেন, যার মর্মার্থ হলো ঃ "আমাকে তুমি কিসের ভয় দেখাও? আমি এমন শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করে নিশ্চিন্ত হয়ে আছি, যিনি আমার রব হিসাবে আমাকে রক্ষা করার যোগ্য, আর যিনি তোমাদের রব হিসাবে তোমাদেরকে আমার উপর হস্তক্ষেপ করা থেকে ফিরিয়ে রাখতে সক্ষম।" (সূরা আল- মু'মিন)

সর্ব শক্তিমান আল্লাহ পাকের উপর এ নির্ভরতা ও তাঁরই নিকট খাঁটিভাবে আশ্রয় নেয়ার পর সত্যিকারের মু'মিনের অন্তর অবশ্যই ভয়শূন্য হয়ে যায়। আর এ আশ্রয়ের পর যখন দেখা যায় যে, আল্লাহ পাক দুশমনকে অদ্ভুতভাবে দমন করেন, তখন অন্তর আরও নির্ভয় হয়ে যায়। আসল কথা হলো বান্দাহকে মুনিবের নিকট পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করতে হবে এবং মুনিবের দ্বীনের জন্য জীবন দেয়ার আন্তরিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এটাই মুনিবের নিকট সঠিকভাবে আশ্রয় নেয়ার নিয়ম।

ধর্মীয় মহলের বিরোধিতা

ইসলাম বিরোধী ও কায়েমী স্বার্থের বিরোধিতা ছাড়া এক শ্রেণীর ধর্মীয় মহল থেকেও ইসলামী আন্দোলনের বিরোধিতা করা হয়। রাসূলুল্লাহ (সঃ) আশা করেছিলেন যে, ইয়াহুদী ও নাসারা উলামা ও মাশায়েখ (কুরআনের ভাষায়) আহবার ও রুহবান) তাঁর দাওয়াত সহজেই কবুল করবে। কারণ আল্লাহ, রাসূল, ওয়াহী, আখিরাত ইত্যাদি বুনিয়াদী বিশ্বাস তাদের রয়েছে। কিন্তু দেখা গেল যে, তারাই রাসূল (সঃ) -এর বেশী বিরোধিতা করলো। তারা প্রচলিত বাতিল সমাজ ব্যবস্থার বিরোধী ছিল না। আল্লাহর দ্বীনকে সমাজে কায়েম করার কোন চেষ্টাও তাদের ছিল না। তারা নিজ নিজ ধর্মটুকু নিয়ে ব্যস্ত ছিল। মানুষের মনগড়া আইন, শাসন ও সমাজকে তারা মেনে নিয়ে জীবন কাটাচ্ছিল। বাতিলের সাথে তারা আপোস করে নিজেদের ধর্মীয় নেতৃত্ব নিয়েই সন্তুষ্ট ছিল।

যে সব ধর্মীয় মহল জামায়াতের বিরোধিতা করেন, তাদের অবস্থাটা প্রায় ঐ ধরনেরই। ইসলাম বিরোধী মতবাদ, চিন্তাধারা ও শক্তির বিরুদ্ধে তাদেরকে সক্রিয় দেখা যায় না। বর্তমান ইসলাম বিরোধী সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করে কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী দেশকে গড়ে তুলবার কোন পরিকল্পনা বা প্রচেষ্টা নিয়ে তাদেরকে মাথা ঘামাতেও দেখা যায় না। জড়বাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, সমাজতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ যে দ্বীনের বিরুদ্ধে কত বড় ফিতনা (দ্বীনের পথে বাধা), তা তারা অনুভব করেন বলেও টের পাওয়া যায় না। অথচ তারা ফতোয়া দেন যে, জামায়াতে ইসলামী নাকি একটা বড় ফিতনা।

যারা এ জাতীয় ফতোয়া প্রচার করে বেড়ান, তাদের মোকাবিলা করা জামায়াত প্রয়োজন মনে করে না। কারণ জামায়াত তাদেরকে ইসলাম বিরোধী শক্তি মনে করে না। অবশ্য ফতোয়া ইসলামের দুশমনের কাজে লাগে এবং ইসলামী আন্দোলনের বিরোধিতার সহায়ক হিসাবে কাজ করে। জামায়াতের পক্ষ থেকে এসব ফতোয়ার জওয়াব দেয়া হয় না। তাদের বিরোধিতার ব্যাপারটিও আল্লাহর হাতে ছেড়ে দেয়াই জামায়াত ঠিক মনে করে।

ইসলামের জন্য যারা কাজ করে, তাদের কাজ যতই ক্ষুদ্র হোক, তাদের খেদমতকে জামায়াত সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে। অবশ্য ইসলামের শুধু ধর্মীয় দিকটুকুর মধ্যেই তাদের খেদমত সীমাবদ্ধ। ইসলামের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক

ও সামাজিক দিককে কায়েম করার দিকে যাদের মনোযোগ নেই, তারা জামায়াতের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিলেও তাদের ধর্মীয় খেদমতকে জামায়াত শ্রদ্ধা করে।

তাই তাদের বিরুদ্ধে কিছু বলা ইসলামের জন্য ক্ষতিকর মনে করেই জামায়াত নীরবে তাদের ফতুয়ার আঘাত সহ্য করে যায়। তাদের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হলে ইসলামের দুশমনদের নিকট ইসলামকে হাস্যস্পদ করা হবে বলে জামায়াত মনে করে এবং তাদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হওয়াকে দ্বীনের জন্য ক্ষতিকর মনে করে।

গত এপ্রিল মাসে (১৯৮১) কতক মুক্তিযোদ্ধা যখন জামায়াতকে উৎখাত করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো, তখন একটি উলামা সংগঠনের জনৈক নেতা জামায়াতকে আঘাত করার একটা মহা সুযোগ মনে করে পত্রিকায় এক জঘন্য বিবৃতি দিলেন। এ বিবৃতিটি জামাাতের বিরোধী পত্রিকায় খুব ফলাও করে প্রকাশ করা হলো এবং ইসলামের দুশমনেরা এটাকে খুব করে কাজে লাগালো। জামায়াতের পক্ষ থেকে এ বিবৃতির কোন জবাব দেয়া হয়নি। কারণ এ জাতীয় বিবৃতির জওয়াব না দেয়াই প্রকৃত জওয়াব বলে জামায়াত মনে করে। জামায়াত এ কথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, দ্বীনে হকের যে দাওয়াত নিয়ে জামায়াত কাজ করে এ সত্যতা সূর্যের মতোই উজ্জ্বল। ফতোয়া দিয়ে ফতোয়াবাজদের প্রভাবাধীন কিছু লোককে কিছুদিন হয়তো জামায়াত থেকে ফিরিয়ে রাখা যেতে পারে। কিন্তু ফতোয়াদাতাদের শাগরেদগণের মধ্যেও বহু লোক ইকামাতে দ্বীনের ফরয দায়িত্ব পালন করার জন্য জামায়াতকে সমর্থন করছেন এবং তাদের সংখ্যা আল্লাহর ফযলে দ্রুত বেড়েই যাচ্ছে।

ইসলামী আন্দোলনের বিরোধিতা সম্পর্কে আরও একটা কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইসলামী আন্দোলনের মাধ্যমে কর্মীদের মধ্যে যেমব ইতিবাচক গুণ সৃষ্টি হয়- ঈমান, ইলম ও আমলের দিক দিয়ে যে যোগ্যতার জন্ম হয় সেটুকু ইকামাতে দ্বীনের জন্য মোটেই যথেষ্ট নয়। ইসলাম বিরোধীদের দুশমনীর ফলে সবর, হিকমত, তাওয়াক্কুল, নির্ভরতা, সাহসিকতা ইত্যাদি অগণিত গুণ দ্বারা কর্মীরা সজ্জিত হওয়ার সুযোগ পায়। তাই বিরোধিতাকেও ইসলামী আন্দোলনের জন্য পরোক্ষভাবে উপকারী বলেই জামায়াত মনে করে।

শেষ কথা

জামায়াতে ইসলামী নবীর দাওয়াত নিয়েই ময়দানে কাজ করছে বটে, কিন্তু এ জামায়াত দোষত্রুটি থেকে মুক্ত নয়। কুরআন ও সুন্নাহর দলীল দিয়ে যারা কোন দোষ ও ভুল সংশোধনে সাহায্য করতে চান, তাদেরকে জামায়াত উস্তাদের মর্যাদা দেয়। কিন্তু ফতোয়া দিয়ে যারা মানুষকে এ পথে আসতে বাধা দেন, তারা আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে ফিরিয়ে দেয়ার মহা অন্যায়ের দরুন আখিরাতে পাকড়াও হবেন কি না সেটা ভেবে দেখার দায়িত্ব তাদেরই।

জামায়াত কারো বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করে না। জামায়াতের বিরোধিরাও হিদায়াতের পথে আসুক এটাই জামায়াতের সাধনা। তাই বিরোধিদের বিরোধিতা করার নীতি জামায়াত গ্রহণ করেনি।

জামায়াতের যে ৭টি বৈশিষ্ট্য এ আলোচনায় পেশ করা হয়েছে, এসবের জন্য জামায়াতের কর্মীদের মধ্যে যেন গর্ব বা অহংকার পয়দা না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। দেশের অন্যান্য দলের সাথে জামায়াতের তুলনা করলে অবশ্যই অহংকার দেখা দিতে পারে। কিন্তু ইকামাতে দ্বীনের যে মহান উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য এ জামায়াতের সৃষ্টি, সে উচ্চ লক্ষ্য অর্জন করতে হলে এসব বৈশিষ্ট্য বর্তমানে যে মানে আছে তাতে সন্তুষ্ট থাকার প্রশ্নই ওঠে না। বুদ্ধিমান পথিক যেটুকু পথ অতিক্রম করেছে, সেটুকুর দিকে বার বার ফিরে ফিরে দেখে আত্মতৃপ্তিবোধ করে না। গন্তব্যস্থল কতদূর সেদিকে লক্ষ্য করে দ্রুত এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টাই সে করে। তাই জামায়াতের সাথে সম্পর্কিত সবাইকে এ বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে। সাহাবা কিরামের জামায়াতই আমাদের আদর্শ। ঐ মানে পৌঁছা সম্ভব না হলেও ঐ লক্ষ্যবিন্দুকে অর্জনের চেষ্টা করতে থাকতে হবে। তাহলে কোন সময়ই আত্মতৃপ্তির রোগ দেখা দেবে না।

পূর্বে উল্লেখ করা সত্ত্বেও একটা কথা আবার সবাইকে মনে রাখার তাকিদ দিচ্ছি। দেশে জামায়াতে ইসলামীর চেয়ে উন্নত মানের কোন ইসলামী আন্দোলন না থাকাটা মোটেই খুশির বিষয় নয়। যদি আরো কোন জামায়াতকে আমরা সত্যিকার ইসলামী আন্দোলনে নিয়োজিত দেখতে পেতাম, তাহলে এ সান্ত্বনা

বোধ করতাম যে, জামায়াতে ইসলামী যদি ইসলামকে বিজয়ী করতে সক্ষম না হয়, তাহলে অন্য কারো দ্বারা এ মহান উদ্দেশ্য সফল হতে পারে। আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে তাওফীক দিন যাতে জামায়াত দেশের সমস্ত মুখলিসীনে দ্বীনের সহযোগিতা পায়। আল্লাহ্ পাক যেন তাদের অন্তরকে খুলে দেন যাতে তারা এ আন্দোলনে শরীক হয়ে ইসলামকে বিজয়ী করতে এগিয়ে আসেন।

লেখকের "ইসলামী ঐক্য ইসলামী আন্দোলন" এবং "বাংলাদেশ ও জামায়াতে ইসলামী" পুস্তিকা দুটো দ্রষ্টব্য।

ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের বৈশিষ্ট্য

আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার প্রচেষ্টা চালানো প্রত্যেক মুসলিমেরই কর্তব্য। দুঃখের বিষয় যে, এ কর্তব্যবোধই মুসলমানদের সবচেয়ে কম। ইকামাতে দ্বীনের দাওয়াতে আকৃষ্ট হয়ে যারা এ কর্তব্য পালনে এগিয়ে আসেন এবং ইসলামী আন্দোলনে শামিল হন, তাদের মর্যাদা আল্লাহর কাছে অবশ্যই উচ্চ। এ মহান দায়িত্ব পালনের জন্যই আল্লাহ্ পাক যুগে যুগে নবী পাঠিয়েছেন। তাই দুনিয়ায় এ কাজের চেয়ে মহত্তর কাজ আর হতে পারে না।

যে কাজ যত গুরুত্বপূর্ণ, সে কাজের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জন করা ততই কঠিন। এ জন্যই ইকামাতে দ্বীনের জন্য আল্লাহ্ পাক সরাসরি ট্রেনিং দিয়েছেন নবীদেরকে। যারা এ মহান দায়িত্ব পালন করতে আগ্রহী, তাদেরকে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে ঐ গুণ অর্জন করতে হবে যা এ কাজের জন্য অপরিহার্য। যারা এ কাজ করে না, তারা অবশ্যই মুসলিম জীবনের প্রধানতম দায়িত্বে অবহেলা করছে। কিন্তু যারা এ কাজে নিয়োজিত থেকেও এর প্রয়োজনীয় গুণাবলী দ্বারা নিজেদেরকে সজ্জিত করে না, তারা এ মহান কাজকে নষ্ট করে। ইসলামী আন্দোলন না করা অবশ্যই অপরাধ। কিন্তু নিজেদের দোষত্রুটির দরুন যারা আন্দোলনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, তাদের অপরাধ জঘন্য।

এ জন্যই ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের যে সব বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন, সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। নিজেদের সময়, শ্রম ও অর্থ আল্লাহর পথে খরচ করেও ঐ সব বৈশিষ্ট্যের অভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে ব্যর্থ হলে দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ই বরবাদ। তাই ইসলামী আন্দোলনের সাথে সম্পর্কিত সবার দৃষ্টি কতক বুনিয়াদী বৈশিষ্ট্যের প্রতি আকর্ষণ করতে চাইঃ

১। সর্বপ্রথম বৈশিষ্ট্য হলো ইখলাস বা আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও নিঃস্বার্থতা। একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখিরাতের নাজাতের উদ্দেশ্যেই ইকামাতে দ্বীনের আন্দোলনে শরীক হতে হবে। দুনিয়ার কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ যদি উদ্দেশ্য হয়, তাহলে কোন না কোন পর্যায়ে আন্দোলন থেকে ছিটকে পড়ার আশংকা রয়েছে। আন্দোলনে যোগদান করার সময়ে ইখলাস থাকা সত্ত্বেও পরবর্তীকালে ব্যক্তিস্বার্থ নিয়তকে কলুষিত করতে পারে।

আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার প্রচেষ্টা ইবলীসের নিকট সবচেয়ে বেশী অপছন্দনীয়। তাই এ পথে যারা আসে, তাদের বিভিন্ন প্রকার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ইবলীস তাদেরকে পথভ্রষ্ট করার আপ্রাণ চেষ্টা চালায়।

আল্লাহ্ পাক এ পথে পদে পদে পরীক্ষা করেন। একমাত্র ইখলাসের বলেই এসব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব। প্রতিটি পরীক্ষা ইসলামী আন্দোলনের কর্মীকে প্রমোশন দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু ইখলাসের অভাব হলে কোন না কোন পরীক্ষায় ফেল করাই স্বাভাবিক। পরীক্ষার কয়েকটি ধরন থেকে এ বিষয়টা স্পষ্টভাবে বুঝা সহজ হতে পারে।

(ক) ইসলামী আন্দোলনে শরীক হওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই ইসলামের দাবী অনুযায়ী জীবনে এমন পরিবর্তন আসতে থাকে যা পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের নিকট মোটেই পছন্দীয় নয়। এদ্দিন পর্যন্ত যেসব অভ্যাস, রুচি ও চালচলনে এরা সবাই তাকে সংগী হিসাবে পেয়েছে সেসব ত্যাগ করার ফলে তাদের সাথে মানসিক দূরত্ব সৃষ্টি হওয়ারই কথা। আন্দোলনের কর্মীর জন্য তখন দুটো পথের একটিকে বাছাই করে নিতে হয়। যদি দ্বীনের ব্যাপারে তার ইখলাস থাকে, তাহলে সে তার সাথে সম্পর্কিত সবার জীবনেই তার মতো পরিবর্তন আনার চেষ্টা করে। যারা এতে রাযী হয় তাদের সাথেই তার সম্পর্ক বহাল থাকে। আর যারা এ পথে আসতে প্রস্তুত নয় তারা ধীরে ধীরে তার সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করে দূরে সরে যায়। কিন্তু ইখলাসের অভাব থাকলে এ স্নায়ুযুদ্ধে সে পরাজিত হয় এবং স্ত্রী, সন্তান, আত্মীয় ও বন্ধুরাই জয়ী হয়। সে তখন ধীরে ধীরে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। অবশেষে আন্দোলনের ময়দান থেকেই পালিয়ে যায়।

(খ) ইসলামের দাবী অনুযায়ী সে যখন রুযী রোযগারকে হারাম থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করে, তখন ক্রমেই তার আর্থিক অনটন বাড়তে থাকে। বিবি-বাচ্চারা যখন খাওয়া-পরায় আগের চেয়ে গরীব হয়ে যাচ্ছে বলে বুঝতে পারে, তখনই সমস্যার সৃষ্টি হয়। যদি ইসলামের ব্যাপারে ইখলাস থাকে, তাহলে হালাল কামাইর ফলে অসচ্ছল জীবন যাপনেই পরিবারকে রাযী করতে চেষ্টা করবে। কিন্তু ইখলাসের সামান্য ত্রুটি থাকলে বিবি-বাচ্চাদের চাপে আবার আরামের আশ্রয় নিয়ে ধীরে ধীরে আন্দোলন থেকে সরে পড়বে।

(গ) ইসলামী আন্দোলনে অগ্রসর হওয়ার পর ইসলাম বিরোধী সরকার ও অন্যান্য শক্তির পক্ষ থেকে যখন বাধা আসে, তখন ইখলাসই তার মনোবল যোগায়। জেল ও অন্যান্য যুলুম তাকে আরও মযবুত বানায়। সে তখন এসব বাধা-বিপত্তিকে আল্লাহর পথে উন্নতির সোপান বলে মনে করে। কিন্তু ইখলাসের মধ্যে ত্রুটি থাকলে কোন এক পর্যায়ে সে সবর করতে অক্ষম হবে এবং ক্রমে পিছিয়ে পড়বে। কোন বিপদের ঝুঁকি নিতে সে সাহস করবে না।

(ঘ) আন্দোলনে ছোট-বড় কোন দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হলে বাইতুল মালের ইখতিয়ার, নেতৃত্ব করার সুযোগ ও সকল মহলে আন্দোলনের প্রতিনিধিত্বের মর্যাদা পাওয়া যায়। যদি ইখলাস থাকে, তাহলে এ সব কর্তৃত্ব ও পদমর্যাদাকে আকাঙ্ক্ষার বিষয় মনে করে না বরং দায়িত্ববোধের গভীরতার দরুন নেতৃত্ব না পেলেই সন্তুষ্ট হয়। ক্ষমতা, সম্মান ও মর্যাদা যত ছোটই হোক, এর একটা বিরাট মোহ মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। একমাত্র ইখলাসের হাতিয়ারই এ মোহ থেকে রক্ষা করতে পারে।

পদমর্যাদা ও নেতৃত্ব স্থায়ী হতে পারে না। আন্দোলনে যোগ্যতর লোক পাওয়া গেলে পুরনো ব্যক্তির জায়গায় নতুন লোক নেতা হিসাবে স্বীকৃতি পাবেই। ইখলাসের এ পরীক্ষায় অনেকেই পাস করতে অক্ষম হয়। সকলেই খালিদ বিন ওয়ালীদের মতো পদচ্যুত হয়েও সন্তুষ্ট থাকতে সক্ষম হয় না। ইসলামী আন্দোলনের কোন পদ থেকে অপসারিত হওয়ার পর যে ব্যক্তি নতুন দায়িত্বশীলের প্রতি আন্তরিকভাবে আনুগত্য প্রকাশ করতে সক্ষম হয়, সে ব্যক্তি পদচ্যুত হওয়া সত্ত্বেও মর্যাদা ও সম্মান থেকে বঞ্চিত হয় না। বরং নতুন দায়িত্বশীল তাকে যথাযোগ্য সম্মান দেয় এবং মুরব্বি মনে করে তার পরামর্শ নিয়ে কাজ করে। তাঁর ইখলাসপূর্ণ নেতৃত্ব পদের বাইরেও চালু থাকে। কিন্তু ইখলাসের গোলমাল থাকলে তার কথাবার্তা ও আচরণে অসন্তুষ্টি প্রকাশ পায় এবং ক্রমে এ মনোভাব তাকে আন্দোলন থেকে দূরে সরিয়ে আনে।

২। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীর দ্বিতীয় প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো দ্বীনের ইলম হাসিল করার নেশা। প্রকৃতপক্ষে এ পথের বড় খোরাকই হলো কুরআন-হাদীসের জ্ঞান। ইসলামী সাহিত্য কিছু পরিমাণ পড়া ও প্রচার করার পর যখন কর্মী অনুভব করে যে, তার পরিচিত মহলে সে রীতিমত আলিমের পজিশন পেয়ে গেছে, তখন সে নিজের সামান্য ইলমকেই যথেষ্ট মনে করতে থাকে। ইলমের

মহাসমুদ্রের সন্ধান পাওয়ার পথে এর চেয়ে বড় কোন বাধা নেই। যদি সে দ্বীনের ইখলাসের অধিকারী হয়, তাহলে গোটা কুরআন-হাদীসের জ্ঞান হাসিল না করা পর্যন্ত নিজকে অত্যন্ত কাংগাল মনে করবে। অর্জিত ইলমে সন্তুষ্ট ব্যক্তির নিকট প্রকৃত ইলম ধরাই দেয় না।

কুরআন-হাদীসের অবিরাম চর্চা ক্রমে এমন গভীর দৃষ্টি দান করে যে, সে আলো দ্বারা জীবনের সব প্রশ্নেরই সন্তোষজনক জওয়াব পাওয়া যায়। এ ধরনের যোগ্যতা ঘরে বসে শুধু অধ্যয়ন করেই লাভ করা যায় না। আন্দোলনের ময়দানে সক্রিয় থাকা অবস্থায় কুরআন-হাদীসের ইলম হাসিলের চেষ্টা করলে ঐ হিকমাত লাভ করা যায়, যে বিষয়ে আল্লাহ্ পাক বলেছেনঃ "যাকে হিকমত দান করা হয়েছে, তাকে অনেক মংগল দেয়া হয়েছে।"

৩। তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হলো আমল বা বাস্তব জীবনে দ্বীনের আন্তরিক আনুগত্য। দ্বীনের যেটুকু ইলম হাসিল হলো সে অনুযায়ী যে আমল করতে রাযী নয়, সে ইসলামী আন্দোলনের জন্য এক আপদ। কারণ আন্দোলনের কর্মীর জীবন থেকেই অন্য লোক ইসলামের ধারণা পাবে। কর্মী শুধু কথায় ইসলামের দাওয়াত দিলে এ দাওয়াত কেউ গ্রহণ করবে না। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনধারা, তার আচার-ব্যবহার, লেন-দেন ইত্যাদিতে যদি ইসলামের প্রকৃত নমুনা পেশ করতে না পারে, তাহলে এমন কর্মী দ্বারা অন্য লোক কি করে আকৃষ্ট হবে? এ কারণেই আন্দোলনের সকল পর্যায়ের নেতৃত্বে এমন লোকেরই প্রয়োজন, যার চরিত্র অন্যদের জন্য অনুকরণযোগ্য।

আমল ও চরিত্রের এ গুরুত্বের দরুনই অন্যান্য শত যোগ্যতা সত্ত্বেও বাস্তব জীবনে ইসলামের সত্যিকার অনুসারী না হলে ইসলামী সংগঠনে নেতৃত্ব দূরের কথা সদস্যের মর্যাদা দেয়াও অনুচিত। চরিত্রের একটা নিম্নতম মান নির্ধারিত না করে অন্যান্য যোগ্যতা থাকলেই যদি ইসলামী সংগঠনে লোক ভর্তি করা হয়- এমনকি নেতা বানানো হয়, তাহলে এ ধরনের সংগঠন আর যাই করুক, ইসলামকে বিজয়ী করার কাজে কোন অবদান রাখতে সক্ষম হবে না।

৪। চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হলো সংগঠনের পূর্ণ আনুগত্য। যে কর্মী নিজের মতকে এতটা সঠিক মনে করে যে, সংগঠনের সিদ্ধান্ত অমান্য করার জন্য তৈরি হয়ে যায়, সে আন্দোলনে শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারবে না। নিজেকে অতি

বুদ্ধিমান মনে করলে কোন সংগঠনেই তার পক্ষে খাপ খাওয়ানো সম্ভব হবে না। নিজের মতামত সাংগঠনিক পদ্ধতিতে অবশ্যই বলিষ্ঠভাবে পেশ করতে হবে। কিন্তু সংগঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সংস্থার সিদ্ধান্ত যদি তার মতামতের বিপরীতও হয়, তবু আনুগত্য করতে হবে। যারা সংগঠনের আনুগত্য করতে অক্ষম, তাদের স্থান সংগঠনের বাইরে হওয়া, স্বাভাবিক। তাদেরকে ধরে রাখার বা সামলানোর সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হতে বাধ্য। কারণ, এটা এমন এক রোগ, যার কুফল কোন না কোন সময় দেখা দেবেই। তাই জামায়াতে ইসলামী এর রুকনদের নিকট সংগঠনের প্রতি আনুগত্যের উপর এত গুরুত্ব আরোপ করে।

৫। পঞ্চম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো 'দায়ী ইলাল্লাহ' হিসাবে সঠিক দায়িত্ববোধ। আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত দেয়ার কাজ প্রত্যেক কর্মীই যদি নিজের মনের তাকিদে না করে, তাহলে সে সত্যিকার কর্মী নয়। সংগঠনের পক্ষ থেকে চাপ ও তাকিদ দিয়ে যাদেরকে কাজ করাতে হয়, তারা আসল কর্মী নয়। যাদেরকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে হয়, তারা ইকামাতে দ্বীনের প্রকৃত দায়িত্ব বোধ থেকে বঞ্চিত। সত্যিকার কর্মীর মনোভাব হলো 'আর কেউ এ কাজ করুক বা না করুক আমাকে তো একা হলেও এ কাজ করতে হবে।' কারণ, এ কাজ যার সন্তুষ্টি ও করুণা পাওয়ার জন্য করতে হবে, তিনি প্রত্যেকের মনের খবর রাখেন।

ইসলামী আন্দোলনে স্বয়ংক্রিয় কর্মীর সংখ্যা যে পরিমাণ বাড়বে সংগঠন সে পরিমাণেই শক্তিশালী হবে। যে কর্মীকে বারবার তাকিদ দিয়ে কাজ করাতে হয়, সে সংগঠনের সম্পদ নয়- সে সংগঠনের জন্য বোঝা স্বরূপ।

—————— o ——————

জামায়াতে ইসলামীকে জানার জন্য
নিম্নলিখিত বইগুলো পড়ুন

জামায়াতে ইসলামীর পরিচয়
১. পরিচিতি –বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
২. বাংলাদেশ ও জামায়াতে ইসলামী
৩. জামায়াতে ইসলামীর বৈশিষ্ট্য
৪. ইসলামী দাওয়াত ও কর্মনীতি
৫. জামায়াতে ইসলামীর কর্মনীতি
৬. মুসলমানদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্মসূচি

জামায়াতে ইসলামীর সংগঠন
৭. গঠনতন্ত্র–বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
৮. মেনিফেস্টো–বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
৯. সংগঠন পদ্ধতি– বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
১০. ব্যক্তিগত রিপোর্ট বই (কর্মী ও রুকন)
১১. অমুসলিম নাগরিক ও জামায়াতে ইসলামী
১২. ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যৎ কর্মসূচি

জামায়াতে ইসলামীর আন্দোলন
১৩. সত্যের সাক্ষ্য
১৪. ইকামাতে দ্বীন
১৫. ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের প্রাথমিক পুঁজি
১৬. হেদায়াত
১৭. ইসলামী আন্দোলনঃ সাফল্যের শর্তাবলী
১৮. ইসলামী আন্দোলনঃ কর্মীদের সহীহ্ জযবা
১৯. ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন
২০. ইসলামী বিপ্লবের পথ
২১. বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ ও জামায়াতে ইসলামী
২২. গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও জামায়াতে ইসলামী
২২. ইসলামী আন্দোলনে কর্মীর কাজ

জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস
২৩. কার্যবিবরণী–বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী (১ম ও ২য় খণ্ড)
২৪. জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস
২৫. জামায়াতে ইসলামীর সংসদীয় ইতিহাস
২৬. মাওলানা মওদূদী

প্রকাশনা বিভাগ
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
৫০৪/১, এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৮৩৫৮৯৮৭, ফ্যাক্স : ৯৩৩৯৩২৭